بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী খিলাফত সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মডেল

১. সূচনা

বিগত ৩৮ বছর ধরে বাংলাদেশের সকল সরকার ধারাবাহিকভাবে বিদেশী শক্তিগুলোর প্রতি নতজানু নীতি অবলম্বন করেছে। বিদেশীদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করার ক্ষেত্রে তারা কখনও দ্বিধা করেনি। ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারকেও আমরা একই পথ অনুসরণ করতে দেখছি। নব্য-ক্রুসেডার কাফের-মুশরেক রাষ্ট্রগুলোর পদসেবা করার জন্য ক্ষমতাসীন সরকার শুরু থেকেই বিভিন্ন প্রকার চুক্তি স্বাক্ষর করার এবং সন্ত্রাস দমনের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে আসছে। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে আজ পর্যন্ত সরকার যেসব চুক্তি করার বা নীতি বাস্তবায়নের তৎপরতা দেখাচ্ছে তা নিম্নরূপ-

- ক্রুসেডার আমেরিকা এবং বাংলাদেশের শত্রু ও মুশরেক রাষ্ট্র ভারতের সাথে দক্ষিণ এশীয় সন্ত্রাসবিরোধী টাস্কফোর্স গঠন
- ভারতের সাথে ট্রানজিট চুক্তি
- মার্কিনীদের সাথে টিফা চুক্তি
- ১/১১-এর সরকারের পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সাথে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক বৃদ্ধি
- ভারতের সামরিক বাহিনীর সাথে যৌথ মহড়া

আজকে আমাদেরকে আলোচ্য চুক্তি ও নীতিসমূহের প্রভাব পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, যাতে করে এগুলোর বিপদ সম্পর্কে সচেতন হবার পাশাপাশি আমরা প্রয়োজনে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। শুরুতেই আমাদের একটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে আর তা হলো এই চুক্তিগুলোকে শুধুমাত্র সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ভুল হবে। বরং চুক্তিগুলো সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পেতে হলে আমাদেরকে দুইটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে:

- **প্রথমত:** যেহেতু বিশ্বের পরাশক্তি ও আঞ্চলিক শক্তিসমূহ এই চুক্তিগুলোর সাথে জড়িত, তাই সারা বিশ্বে তারা যেসব তৎপরতা চালাচ্ছে এবং ঘটনার জন্ম দিচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় এই চুক্তিগুলোকে দেখতে হবে।

- **দ্বিতীয়ত:** ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির আলোকেও আমাদেরকে চুক্তিগুলোকে বিচার করতে হবে। কারণ বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ এবং বিশ্বের বৃহৎ পরাশক্তিসহ প্রতিবেশী দেশগুলোও আমাদেরকে সেভাবে দেখে। আর মুসলিম হিসেবে আমরা ইসলামের প্রেক্ষিতে সব কিছু দেখতে বাধ্য। অর্থাৎ সার্বিকভাবে ইসলাম একটি ইস্যু, যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং, চুক্তিগুলোর ব্যাপারে একটি ধারণা পেতে হলে এ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

মুসলিম উম্মাহ্‌কে পদানত করা, মুসলিম ভূখন্ডের সম্পদ লুন্ঠন আর রাজনৈতিকভাবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্থ করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নতুন ক্রুসেড শুরু করেছে এবং একের পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা করছে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র, যেখানে পনের কোটি মানুষের বসবাস, সেই বাংলাদেশ তাদের ক্রুসেডের টার্গেট। তাই এই নব্য-ক্রুসেডারদের সাথে যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরের চিন্তা করার আগে তাদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরী।

<u>সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিশ্বায়ন:</u> সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মৃত্যু হয়েছে এবং পুঁজিবাদী আদর্শ সাময়িক বিজয় লাভ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কালবিলম্ব না করে ইরাকের কুয়েত আক্রমণ প্রতিহত করার নামে মধ্যপ্রাচ্যে নিজের সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। পুরো নব্বই দশক জুড়ে বিভিন্ন কায়দা-কানুন করে সারা বিশ্বে নিজের একচ্ছত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর টুইন টাওয়ার হামলা-পরবর্তী ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ ও ‘ব্যাপক-বিধ্বংসী অস্ত্রের’ অজুহাতে আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ, দেশগুলো দখল ও তাদের সম্পদ কুক্ষিগত করেছে মার্কিনীরা। একইভাবে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিকে পশ্চিমা বিশ্ব নিজেদের সুবিধা মত সাজিয়ে নিয়েছে। মানুষের সম্পদ লুটপাটের জন্য ‘বিশ্বায়ন’ (Globalization) নামে নতুন এক ধারণার জন্ম দিয়েছে তারা। বিশ্বায়নের নামে সারা বিশ্বে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসা, বিনিয়োগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠা করছে। যে পরিমাণ অর্থ তারা লগ্নী করে, তার চেয়ে বহুগুণ অর্থ ঐ দেশের জনগণকে শোষণ করে তারা নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর পুরো ব্যাপারে জনগণকে নেশাগ্রস্থ ও অন্ধকারে রাখার জন্য রয়েছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও মিডিয়া প্রপাগান্ডা।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজা রাইসের ২০০০ সালে ফরেন এফেয়ার্স - এ লেখা এক নিবন্ধে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে - (US Foreign Policy)...will also proceed from the firm ground of the national interest, not from the interests of an illusory international community... (US)... ought to decide *unilaterally* where, when, how and what to attack. এরপর কারো প্রশ্ন থাকা উচিত নয় কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে তান্ডব ও ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে। নতুন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বৈদেশিক নীতি এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা যদি আমরা গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি তবে আমরা দেখতে পাবো যে বিশ্বের এক নম্বর মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে একেকটি অঞ্চল নিজের অনুগত কোন মোসাহেবের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। যেমন বৃটেনকে দিয়েছে ইউরোপ, ইসরাইলকে দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্য, অষ্ট্রেলিয়াকে দিয়েছে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারতকে দিয়েছে দক্ষিণ এশিয়া। এখানেই যুক্তরাষ্ট্র থেমে থাকেনি। মার্কিন স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহে (কৌশলগত, সম্পদ বা যে কারণেই হোক না কেন) নিজের অনুগত, মেরুদন্ডহীন শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসিয়ে রেখেছে। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থ হাসিল করা নিশ্চিত করেছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করছে। মধ্যপ্রাচ্যের পর মার্কিনীদের নজর এখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে। ১৮ই অক্টোবর, ২০০৭ তারিখে জয়েন্ট চীফ অব ষ্টাফ এর নতুন চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল মাইকেল মুলেন ইরাক-আফগানিস্তানের পর পেন্টাগনের নতুন যুদ্ধ ফ্রন্ট সৃষ্টির পরিকল্পনা সম্পর্কিত ইঙ্গিত দিয়ে এক আলোচনায় বলেন, “[US] ...refocus the military's attention beyond the current wars to prepare for other challenges, especially along the Pacific rim and in Africa." এছাড়াও ৯/১১ এর পর অনেক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ধারণা করেছিলেন যে এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন মঞ্চ হিসেবে গ্রহণ করবে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ব্যাপকভাবে সামরিকীকরণ করবে। বারাক ওবামা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে সে ইরাক থেকে সৈন্য সরিয়ে আফগানিস্তানে নিয়ে যাবে। আর তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পাকিস্তান। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চের স্পটলাইট মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার উপর ধরা হয়েছে। Foreign Affairs ম্যাগাজিনের জুলাই/আগষ্ট ২০০৭ সংখ্যায় বারাক ওবামা Renewing American Leadership প্রবন্ধে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া তার পররাষ্ট্রনীতির starting point বলে উল্লেখ করেছে। অন্যদিকে India Abroad ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সংখ্যায় বারাক ওবামা ভারতের সাথে "a close strategic partnership" এর কথা উল্লেখ করে।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে মার্কিনীদের স্বার্থ মূলত ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান এবং বঙ্গোপসাগর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ভারত ও চীনের সংযোগস্থলে। শুধু তাই নয়, ভৌগোলিক দূরত্বের দিক থেকে চীনে পৌঁছার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান মার্কিনীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই গুরুত্বের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে ঘাঁটি স্থাপন করতে উদগ্রীব। বিষয়টি মার্কিনীদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তারা বঙ্গোপসাগরে ভারতের সাথে যৌথ নৌ-মহড়া পর্যন্ত দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় সিডরের সময়ে বাংলাদেশে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে মার্কিনীরা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে বাংলাদেশের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভে তারা কতটা তৎপর।

মার্কিন-ভারত-ইসরাইল চক্র: ইসরাইল ও ভারত – এই দু'টি রাষ্ট্র মার্কিন নীতি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখছে এবং প্রয়োজনে নিজেরা অনুসরণ করছে। এই তিন গণতান্ত্রিক দেশ সন্ত্রাস মোকাবেলার নামে মুসলিম ভূখন্ডে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে একমত। ভারতের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র এই তিন দেশের জোট সম্পর্কে বলেছেন : "Such an alliance would have the political will and moral authority to take bold decisions in extreme cases of terrorist provocation." শীর্ষ পর্যায়ের এক নীতি নির্ধারণী সভায় এই তিন দেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, "The US, India and Israel as sister democracies and common victims of international terrorism should pool their resources and experiences in dealing with this menace." বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই menace হচ্ছে ইসলামী আদর্শের উত্থান (তাদের ভাষায় Political Islam) এবং তাদের এই সিদ্ধান্ত মুসলিম ভূখন্ডের উপর আগ্রাসনেরই নীল নকশা।

বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী: এই উপমহাদেশের সার্বিক বিষয়ের দায়িত্ব ভারত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলতেন যে "India is now saddled with the responsibility to maintain the stability, status-quo and the character of this region." ভারত দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে সবসময় আধিপত্যবাদী নীতি অবলম্বন করে এসেছে। সে প্রতিবেশী দেশগুলোকে তার অধীনস্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেষ্টা করেছে আর এ লক্ষ্যে সে সবসময় তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নানা ধরণের অপতৎপরতার জন্ম দিয়ে আসছে। ভারত বাংলাদেশসহ তার প্রতিবেশী দেশগুলো যেমন: ভূটান, নেপাল ও শ্রীলংকার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সদা তৎপর। ইতিমধ্যেই সে সিকিম ও ভুটানকে অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে নিয়েছে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই অঞ্চলে ভারত ইতিমধ্যেই নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এ ব্যাপারে মার্কিন সমর্থনও তারা আদায় করে নিয়েছে। ভারতের শাসকগোষ্ঠীর কাছে নেপাল, ভূটান বা শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশের মূল পার্থক্য হলো –

এটি একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। এ জনপদের মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামকে তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের উপায় ও পরকালের মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে জাতিভেদ প্রথার সর্বনিম্নে অবস্থিত নমশুদ্রদের ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীর সৃষ্ট এক ভূখন্ডের নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের টিকে থাকা ও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া। এই জন্যে এই ধরণের একটি রাষ্ট্র ও তার জনগণকে ভারতের শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের রাজনীতি, সামরিক নীতি, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করেছে। বিগত দেড় দশকের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সাথে ভারতের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাশের যোগসূত্র স্থাপন করলে বাংলাদেশের জনগণের আতঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর সার কথা হচ্ছে বাংলাদেশ ভারতের শত্রু রাষ্ট্র। ভারত অতীতে কখনোই আমাদের বন্ধু ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনোই আমাদের বন্ধু হবে না।

প্রস্তাবিত চুক্তিগুলোর বিপদসমূহ

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নব্য-ক্রুসেডারদের এই আগ্রাসী নীতির প্রেক্ষিতে এবার আমরা প্রস্তাবিত চুক্তিগুলোর বাস্তবতা এবং বিপদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

- **দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স –** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা। যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ঠুনকো অজুহাত দেখিয়ে আফগানিস্তান, ইরাক, লেবানন ও গাজায় হামলা করেছে, সেই একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও জঙ্গী দমনের অজুহাতে আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। তাছাড়া মার্কিনীরা দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্সের নামে এই অঞ্চলে নিজেদের বৈধ সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চায়। আর ভারত তার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্সকে ব্যবহার করবে, যা বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক নিরাপত্তা হুমকি।

- **ট্রানজিট -** ট্রানজিটের নামে মূলত করিডোর চায় ভারত। অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে নিজের দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে অবাধ যাতায়াতের সুবিধা চায়। একই সাথে connectivity এর নামে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুবিধা চাচ্ছে ভারত। এই সকল শব্দের গোলকধাঁধা এবং কথার মারপ্যাঁচে আমাদের ভুললে চলবে না যে ট্রানজিট বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপত্তা হুমকি:

১. ট্রানজিটের সুযোগ নিয়ে ভারতীয় সেনাবহিনী সামরিক সরঞ্জামসহ তাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের বিদ্রোহ দমনের জন্য বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে চলাচল করবে।

২. একই সাথে বাংলাদেশ ঐ অঞ্চলগুলোর বিদ্রোহীদের টার্গেটে পরিণত হবে।

সুতরাং, ভারতীয় দালালরা যতই ট্রানজিট ইস্যুকে একটি অর্থনৈতিক ইস্যু হিসেবে চালানোর অপচেষ্টা করুক না কেন, এটি মূলত বাংলাদেশের জন্য একটি রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যু।

- **টিফা –** এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথ ব্যবসায়িক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হবে। আর এই কাউন্সিলের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও চাপ প্রয়োগের সরাসরি সুযোগ ও আইনগত ভিত্তি পাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অশুল্ক বাধা অপসারণ, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে মূলত মার্কিনী কোম্পানীগুলোকে স্থায়ী বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদানই এই চুক্তির উদ্দেশ্য।

- **মার্কিন সামরিক উপস্থিতি এবং ভারতের সাথে যৌথ সামরিক মহড়া –** টাস্কফোর্স, ট্রানজিট ও টিফা এখনও আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। **কিন্তু এসব কিছুর আড়ালে ইতিমধ্যেই মার্কিন ক্রুসেডার ও ভারতীয় মুশরেক সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সম্পর্ক বৃদ্ধির ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।** এর ফলেঃ

১. বাংলাদেশের মাটিতে মার্কিন সেনা সদস্যদের উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

২. মার্কিন ও ভারতীয় জেনারেলরা শুভেচ্ছা সফরের নামে নিয়মিত বাংলাদেশ সফর করছে।

৩. বাংলাদেশের সীমান্ত, সমুদ্র সীমা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সামরিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের জরিপ পরিচালনা করছে।

৪. সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা আমাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করছে ও তথ্য সংগ্রহ করছে।

৫. সমুদ্র সীমার নিরাপত্তা সহায়তার অজুহাতে বঙ্গোপসাগরে তাদের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে।

এর পরিণামে আমাদের সেনা সদস্যরা নিজেদের মাটিতে এই ক্রুসেডারদের মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর রিমোট কন্ট্রোল চলে যাচ্ছে ওয়াশিংটন ও দিল্লীর হাতে।

সুতরাং, উপরোক্ত চুক্তিসমূহ আত্মসমর্পণের নামান্তর। এসবই বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডের অংশ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশকে অধীনস্ত করে তারা তাদের কৌশলগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল করতে চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বৃটেন -এরা কেউই কখনও আমাদের বন্ধু হবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

“হে মু’মিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করোনা, তারা একে অপরের বন্ধু ...।” [সূরা মায়েদা : ৫১]

“আপনি মানবজাতির মধ্যে ইহুদী ও মুশরেকদেরকে মুসলমানদের অধিক শত্রু হিসেবে পাবেন... ।” [সূরা মায়েদা : ৮২]

৩. আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাপারে ইসলামী শারী’আহ্র দৃষ্টিভঙ্গি

উপরোক্ত আলোচনার সাথে সাথে আমাদের আরো একটি বিষয় বুঝতে হবে আর তা হচ্ছে এই চুক্তিগুলো ইসলামী শারী’আহ্র দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। ইসলামী বিধিমালা তথা শারী’আহ্ আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহকে বিশেষ ধরণের চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ এগুলো দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে সম্পাদিত চুক্তি বা সমঝোতা। তাই চুক্তি সম্পাদনের মৌলিক বিধিমালাগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বৈধ হিসেবে গণ্য হবার জন্য চুক্তিগুলোকে শারী’আহ্র কিছু আইনের শর্ত পূরণ করতে হবে। আর ঐ শর্তসমূহের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে বর্তমান সরকার যেসব চুক্তি করতে যাচ্ছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও বাতিল:

- চুক্তিটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হতে হবে। চুক্তিটি যেন অবশ্যই ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যদি কোন চুক্তি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কোন উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়ক না হয়, তবে সে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

- চুক্তির বিষয়বস্তু বৈধ হতে হবে এবং চুক্তির মধ্যে কোন অবৈধ শর্ত থাকতে পারবে না। **রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “মুসলিম চুক্তির শর্ত মেনে চলবে যদি না চুক্তিতে এমন শর্ত থাকে যা বৈধ বিষয়কে অবৈধ করে বা অবৈধ বিষয়কে বৈধ করে।” [তিরমিজী]**

- যে কোন চুক্তির সুনির্দিষ্ট মেয়াদ থাকতে হবে। স্থায়ী বা আধাস্থায়ী চুক্তি (অনেক দীর্ঘ সময়, যেমন ৯৯ বছরের চুক্তি) ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম।

- যে চুক্তি মুসলিমদের নতজানু করে রাখে, ইসলামী ভূখন্ডে কাফেরদের সার্বভৌমত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং মুসলিমদের উপর ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করে, সে সব চুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ (হারাম)। কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

  "... এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।" [সূরা আন্-নিসা : ১৪১]

  আর টাস্কফোর্স ও ট্রানজিটের মতো চুক্তিগুলো অবৈধ; কেননা এগুলো মুসলমানদেরকে কাফেরদের অধীনস্থ করার হাতিয়ার।

- কোন কুফর রাষ্ট্রের সাথে সামরিক জোট গঠন করা ইসলামী শারী'আহ্-এর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। যেমন যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তি, যৌথ সামরিক মহড়া এবং বিভিন্ন ধরণের সামরিক সহযোগিতা ইত্যাদি। এমনিভাবে কাফেরদেরকে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেয়া, বিমান বন্দর, নৌবন্দর ইত্যাদি দিয়ে দেয়া ইসলামী নীতিতে হারাম। কারণ মুসলমানদের জন্য কাফেরদের পতাকাতলে লড়াই করা, কুফরী পথে লড়াই করা, কুফর রাষ্ট্র রক্ষার জন্য লড়াই করা এবং কাফের সেনাবাহিনীকে মুসলিম জনগণ বা ইসলামী ভূমির নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা হারাম। দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স, সোফা এবং যৌথ সামরিক মহড়া বা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি এই বিধির আওতায় পড়ে।

- মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সাথে কোন চুক্তি হতে পারে না, যদি না তা হয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি। যুদ্ধবিরতি চুক্তির বাস্তবায়ন হলে তবেই সে রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য চুক্তি করা যেতে পারে।

- অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা, অর্থনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি করা যায়। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এসব চুক্তি মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে হয় ও এর দ্বারা মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণ হয়। তবে ঐ সব রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি পায় এমন শর্তের ভিত্তিতে কোন চুক্তি করা যাবে না। অথচ প্রস্তাবিত সকল বাণিজ্যিক চুক্তিগুলো ঠিক তাই করবে।

উপরে আলোচিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত চুক্তিগুলো বিপজ্জনক আর ইসলামী শারী'আহ্র দৃষ্টিতেও হারাম। এখন আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই প্রেক্ষাপটে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত করা যায়। আমাদের দরকার ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র যার নিজস্ব শক্তিশালী অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও সমরনীতি থাকবে। খিলাফত রাষ্ট্র দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে শত্রু রাষ্ট্রসমূহের মোকাবেলা করবে। দৃঢ়সংকল্প,

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও শক্তিশালী নেতৃত্ব, ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জনগণ ও সশস্ত্রবাহিনীই দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমাদের জন্য নেতৃত্বস্থানীয় রাষ্ট্রের মর্যাদা নিশ্চিত করবে।

৪. খিলাফত সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মডেল

বাংলাদেশের শক্তির উৎস

বাংলাদেশ ছোট রাষ্ট্র নয়। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হবার মতো অনেক উপাদান বাংলাদেশে বিদ্যমান। এদেশে রয়েছে:

- ১৫ কোটি মানুষ, যার অধিকাংশ মুসলমান। নেতৃত্ব দুর্বল ও বিভক্ত হলেও বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে এই জাতি ঐক্যবদ্ধ।

- ভৌগোলিক পরিবেশের (বিশেষতঃ নদীমাতৃক সবুজ সমতল ভূমি) কারণে কোন বহিঃশক্তি কখনো এই ভূমিকে বেশীদিন নিজের অধীনে রাখতে পারেনি। রাশিয়া আক্রমণ করে যেমন হিটলার চরম মাশুল দিয়েছিল, তেমনি এদেশের মাটি দখলে রাখতে যে কোন বিদেশী শক্তির চরম খেসারত দিতে হবে।

- বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এই দেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। অর্থাৎ ভারত ও চীনের মাঝে স্বাধীন মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্ব অনেক। আমরা দেখেছি যে এই কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সেনা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

- অনেকেই ভারতের পেটের ভিতরে বাংলাদেশের অবস্থানকে বাংলাদেশের দুর্বলতা হিসেবে উল্লেখ করেন। ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থান কৌশলগত দিক থেকে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি অন্যতম শক্তির উৎস।

- বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী শৃংখলাবদ্ধ, দক্ষ ও মেধাসম্পন্ন। আর সশস্ত্রবাহিনীর সাথে এদেশের জনগণের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। প্রতিরক্ষা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি দেশের জন্য অন্যতম পুঁজি।

খিলাফত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সুস্পষ্টভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতি সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্ এ আলোকপাত করেছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

(১) "... এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।" [সূরা নিসা : ১৪১]

(২) "তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্ম সহকারে, যাতে একে সকল জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরেকরা তা অপছন্দ করে।" [সূরা আছ্-ছফ : ৯]

(৩) "হে মু'মিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু ...।" [সূরা মায়েদা : ৫১]

(৪) "তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে ...।" [সূরা আলি ইমরান : ১১০]

(৫) "ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন ...।" [সূরা বাকারা : ১২০]

(৬) "আপনি মানবজাতির মধ্যে ইহুদী ও মুশরেকদেরকে মুসলমানদের অধিক শত্রু হিসেবে পাবেন...।" [সূরা মায়েদা : ৮২]

দূরদর্শী চিন্তা (Vision) ও মূলনীতি: উপরোক্ত আয়াতসহ অসংখ্য আয়াত ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ থেকে এটা স্পষ্ট যে ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হবে ইসলামের বাণী ও ন্যায়বিচার পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির সামনে তুলে ধরার নীতিকে কেন্দ্র করে। আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র হবার কারণে খিলাফত সরকারের থাকবে একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব ও দূরদর্শী চিন্তা (Vision)। খিলাফত সরকার পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিবে। ইতিহাসে আমরা দেখেছি, আল্লাহ্'র জমিনে ইসলামের বিজয়ী পতাকা উড়ানোর রাজনৈতিক উচ্চাশার ফলেই আরবের অনগ্রসর জাহেল সমাজ থেকে উঠে আসা সাহাবারা (রা.) মদীনার মত ছোট্ট রাষ্ট্রে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাত্র বিশ বছরের মধ্যে একই সাথে দু'টি পরাশক্তিকে (পারস্য ও রোমান) হারিয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব ইসলামের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বৃটিশদের দু'শ বছর আর রাশিয়া ও আমেরিকার পঞ্চাশ বছরের দুনিয়া শাসনের ইতিহাস থাকলেও খিলাফত রাষ্ট্রের রয়েছে একচ্ছত্রভাবে হাজার বছরের পরাশক্তি থাকার গৌরবময় অতীত।

খিলাফত রাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বকে একীভূত করবে যাতে মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থানের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উদীয়মান শক্তি ভারত, চীন ও রাশিয়ার সাথে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই দেশের মানুষ মার্কিন-ভারত-বৃটেনের প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে আসতে পারবে এবং বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই অন্যের আধিপত্য মেনে নেবে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খিলাফত সরকার সকল ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইলের তাঁবেদারি বন্ধ করবে এবং বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ কঠোরভাবে প্রতিহত করবে। ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইল তথা কোন শত্রু রাষ্ট্রের সাথে যে সমস্ত অযৌক্তিক বা জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করবে। ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইল তথা কোন শত্রু রাষ্ট্রের সাথে কোন ধরণের সামরিক চুক্তি কিংবা ট্রানজিট, গ্যাস পাইপলাইন ইত্যাদি চুক্তি করবে না। ভারতের সীমান্ত আগ্রাসন শক্তভাবে মোকাবেলা করবে। তালপট্টি, পানি আগ্রাসনসহ সকল ইস্যুতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

<u>প্রতিরক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি:</u> খিলাফতের অর্থনীতি হবে প্রতিরক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি। উন্নত প্রতিরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা ও তার ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি ও আধুনিকায়নই হবে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এধরণের অর্থনীতি যে শুধুমাত্র কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টি করবে তা নয় বরং বৈরী পরাশক্তিগুলোর আগ্রাসী পরিকল্পনা থেকেও খিলাফতকে রক্ষা করবে। প্রতিরক্ষা কেন্দ্রিক অর্থনীতির অপরিহার্য করণীয় হলো সমরাস্ত্র তৈরীর কারখানার পাশাপাশি সহায়ক শিল্প হিসেবে স্টীল, লোহা, কয়লা, যানবাহন নির্মাণ, খনিজ উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি শিল্প গড়ে তোলা। খিলাফত সরকার ভারী শিল্পের প্রয়োজনে সহায়ক শিল্প গড়ে তোলার কাজে অনেকাংশেই শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ যোগাবে এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করার সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতি থাকবে। দরকার হলে লোহা, কেমিক্যাল ইত্যাদি শিল্পের জন্য উদ্যোক্তাদেরকে বিনামূল্যে সরকারী জমি বরাদ্দ দিবে; খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও অন্যান্য কেমিক্যাল নিষ্কাশনের জন্য যৌথ বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করবে; যেসব শিল্প রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তায় সরাসরি ভূমিকা রাখছে, তাদের ক্ষেত্রে কর রেয়াত ও ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করবে।

<u>সশস্ত্রবাহিনীর শক্তিশালীকরণ:</u> দেশের নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় সশস্ত্রবাহিনীকে সার্বিকভাবে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন ভীতির সৃষ্টি হয় আল্লাহ্'র শত্রুদের

মধ্যে এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যেও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন...” [সূরা আনফাল : ৬০]

এজন্য–

১. খিলাফত সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে দূরদর্শী চিন্তা তথা ইসলামের বিজয়ী পতাকা উড়ানোর উচ্চাশার (vision) অধিকারী করবে। সশস্ত্রবাহিনীর অবদানকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে তাদের মধ্যে গণহারে শান্তি রক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলা বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে দিয়ে আলু-পটল বিক্রির মত আত্মবিধ্বংসী নীতি আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর শত্রু নিধনের আকাঙ্খাকে দুর্বল করে তুলবে ও তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করবে। প্রকারান্তরে এই সকল ভুল নীতির সুফল ভোগ করবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো।

২. খিলাফত সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন করবে। সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে প্রয়োজনীয় বাজেট, সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের মোকাবেলার জন্য যথাযথ প্রস্তুত রাখবে। সশস্ত্রবাহিনীর বাজেট নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। সামগ্রিক বাজেটের অথবা জিডিপির নির্দিষ্ট কোন শতাংশ অথবা অন্য কোন দেশের সাথে কোন প্রকার তুলনা প্রতিরক্ষা বাজেটের ভিত্তি হতে পারে না। আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট হবে আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে। আর আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. কোন বিষয়গুলোকে রক্ষা করতে হবে তা নির্ধারণ করা একটি জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সমগ্র দেশবাসীর জন্য তিনটি বিষয় রক্ষা করা জরুরী। প্রথমত: এদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ মানুষের বিশ্বাস; দ্বিতীয়ত: দেশের মানুষের জীবন; এবং তৃতীয়ত: রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পদ। উল্লেখিত জীবন ও সম্পদের মধ্যে রয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, ভৌগোলিক পরিবেশ (নদী, মৎস্য ও বনজ সম্পদ ইত্যাদি), খনিজ সম্পদ (গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি) ও কৌশলগত সম্পদ (বন্দর, যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ, তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ, শিল্প ইত্যাদি)।

<u>প্রযুক্তি:</u> খিলাফত সরকার প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের ক্ষেত্রে বিদেশী নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। নিরাপত্তার স্বার্থে ও শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সংগ্রহ ও উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক স্থাপনা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তাদেরকে নিয়ে দেশীয় পারমাণবিক স্থাপনা তৈরী করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষকরা এই মতামত আগেই দিয়েছিলেন। পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পদ্ধতি এবং পরবর্তী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মোকাবিলার পথ নিয়েও তারা ইতিপূর্বে বক্তব্য রেখেছেন। মূল কথা হল পারমাণবিক শক্তি, সাবমেরিন, অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ইত্যাদি যে প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্য অর্জন করতে পারবে, দীর্ঘমেয়াদে খিলাফত সরকার তাই করবে।

সিটিজেন'স আর্মি: খিলাফত সরকার বর্তমান সামরিক-বেসামরিক নিবিড় সর্ম্পককে আরো এগিয়ে নিয়ে সাধারণ জনগণকে দেশের প্রতিরক্ষায় আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত করবে। এই সম্পৃক্ততার ধরণ হবে নিম্নরূপ:

১. সমগ্র জনগণকে প্রাথমিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং দেশের শত্রু-মিত্র সম্পর্কে জনগণকে পরিষ্কার ধারণা দেয়া।

২. ১৫ বছরের উর্ধ্বে দেশের প্রত্যেক তরুণকে বাধ্যতামূলক মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া। দেশে প্রচলিত স্কুল পর্যায়ের সর্বশেষ পরীক্ষার পরে প্রতি স্কুলে দুই মাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা যেতে পারে।

৩. যারা স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে যারা এখনো চল্লিশ বছর অতিক্রম করেননি, তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা।

উকবা ইব্‌ন আমের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে মিম্বারের উপর আসীন অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী *'এবং তোমরা তাদের মোকাবেলায় শক্তি সঞ্চয় করে রাখো।'* **"জেনে রাখো, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী, জেনে রাখো, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী, জেনে রাখো, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী।"** (মুসলিম শরীফ) এখানে খিলাফত রাষ্ট্রের প্রতিটি সক্ষম নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

কূটনৈতিক তৎপরতা: সামরিক শক্তি একটি দেশের নিজস্ব পছন্দ বা সিদ্ধান্ত। কিন্তু কূটনীতির বিষয়টি সেরকম নয়। খিলাফত সরকার বহিঃর্বিশ্বে বন্ধু সন্ধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তবে চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় "Friendship to all, malice to none" জাতীয় হাস্যকর পররাষ্ট্রনীতি একান্তই পরিত্যাজ্য। একমাত্র পাগল ও নাবালকের কোন শত্রু থাকতে পারে না। এই নীতি একটি দেশের দুর্বলতার পরিচয় বহন করে মাত্র। খিলাফত সরকার আমাদের কূটনীতিবিদদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দরকষাকষির জন্য (Negotiation) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

এক্ষেত্রে হুদায়বিয়ার সন্ধির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কুরাইশদের সাথে ব্যাপক দরকষাকষির পর স্বাক্ষরিত এই চুক্তির মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করেছিলেন – চুক্তিটির ফলে সমগ্র আরব বিশ্বে এবং বিশেষ করে কুরাইশদের

মধ্যে ইসলামের পক্ষে জনমত তৈরী হয়েছিল। এছাড়াও এই চুক্তির ফলে খিলাফত রাষ্ট্র কর্তৃক খাইবার বিজয়, এমনকি মক্কা বিজয়ের পথও সুগম হয়েছিলো। কুরাইশদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরব উপদ্বীপে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছিলো। শুধু তাই নয়, রাসূল (সাঃ) এই সময়ে আরবের বাইরেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

৫. উপসংহার

বিশ্বজুড়ে কাফের-মুশরেক শক্তিসমূহ কিভাবে প্রতিদিন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের নতুন নতুন ফ্রন্ট খুলছে তা আমরা দেখছি। অথচ এই ক্রুসেডারদের পদসেবা করার জন্যই বর্তমান সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। কেন? মাত্র কিছুদিন আগে মার্কিন সমর্থনে গাজায় যে গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ হয়ে গেল, তা কি এই সরকার দেখতে পায়নি? কেন এবং কিভাবে আমাদের শাসকেরা সেই সব মার্কিন জেনারেলদের স্বাগত জানায় যাদের হাতে এখনো ইরাক, আফগানিস্তানে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের তাজা রক্ত লেগে আছে? কিভাবে তারা ভারতের সাথে দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স গঠন করার কথা চিন্তা করে, যেখানে ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে ও কাশ্মীরে দশকের পর দশক আগ্রাসন ও হত্যাকান্ড চালাচ্ছে? বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিগত ৩৮ বছর যাবত ভারত একের পর এক ইস্যু তৈরী করে বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। ফারাক্কা বাঁধ, টিপাইমুখ বাঁধ, আন্তঃনদী সংযোগ, কাঁটাতারের বেড়া, পুশইন, ছিটমহল, তালপট্টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, বাণিজ্য ঘাটতি, সমুদ্র সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি অসংখ্য ইস্যু একতরফাভাবে ভারতের তৈরী।

যদি আমরা এই চুক্তিগুলোকে মেনে নেই, তবে আমরা অবশ্যই আখেরাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্রোধের শিকার হব। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতারক শাসকদের সাথে সাথে আপনাকেও প্রশ্ন করবেন। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই এই চুক্তিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সরকার যদি এই চুক্তিগুলো স্বাক্ষর করতে অগ্রসর হয়, তবে তা প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই খিলাফত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসতে হবে, যা আমাদের স্বার্থ সুরক্ষা করবে এবং নব্য ক্রুসেডার ও আধিপত্যবাদী মুশরেকদের চ্যালেঞ্জ ও আগ্রাসন মোকাবেলা করার জন্য যথাযথ নীতি গ্রহণ করবে।

প্রথম ড্রাফ্ট

২৬ সফর, ১৪৩০ হিজরী
২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ